OPEN ACCESS
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 59*
*Website: https://tirj.org.in, Page No. 524 - 535*
*Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue*

***Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)***
***A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture***
*Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 524 - 535*
*Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in*
*(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848*

# বুদ্ধদেব বসুর ‘তপস্বী ও তরঙ্গিনী’ : পুরাণ প্রতিবিম্বে অন্তর্দ্বান্দ্বিক জীবনভাষ্য

প্রজ্ঞা চন্দ
প্রভাষক (বাংলা)
ফ্যাকাল্টি অব আর্টস এন্ড হিউম্যানিটিস
বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস এন্ড টেকনোলজি
ঢাকা, বাংলাদেশ
Email ID : proggachandaritu@gmail.com

***Received Date*** *10. 04. 2025*
***Selection Date*** *23. 04. 2025*

***Keyword***
*Mythology, Archetype, Inner conflict, Verse drama, mythological adaptation, psychological discourse.*

***Abstract***
*The great poet and playwrights Buddhadeva Bose (1908–1974), a prominent figure of the modern era, had a deep understanding of modern human life and psychology. Modern human life and psychology have become increasingly complex, requiring writers to adopt refined narrative techniques. Consequently, he successfully unraveled the intricate inner-conflicts of modern human of the post-World War era. Bose’s childhood memories and academic engagement with comparative literature nurtured his interest in mythology. Myths encompass vast narratives and timeless philosophical archetypes. To portray the internal psychological conflicts of his characters, Buddhadeva Bose, as a modern poet and playwright, drew inspiration from mythology, employing verse drama as his preferred literary form. His involvement in drama began in early adulthood, and he made significant contributions to this genre. Among Bose’s verse plays, Tapasvi O Tarangini (1966) stands out as a remarkable literary creation. Bose derived its central narrative from the Mahabharata, particularly the mythological story of the sage Rishyashringa, unfamiliar with female existence, and the courtesan Tarangini. Through a nuanced depiction of their psychological struggles, Bose reinvented mythology with a modern perspective. He not only adapted mythological events but also reshaped unstated narratives to align with the mythological essence, while designing non-mythological characters to reflect contemporary human nature. The application of mythological symbols in literature is not uncommon, yet Buddhadeva Bose’s interpretation is unique. In this play, he delves into the psychological aspects of male and female characters, transforming the courtesan Tarangini from a figure of mere carnal desire into an embodiment of romantic love. He illustrates the sage Rishyashringa’s moral downfall, self-discovery, and ultimate liberation. Through non-mythological characters, he presents profound insights into life and, most importantly, creates a new lens through which to read mythology. His skillful technique of aligning mythology*

OPEN ACCESS
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 59*
*Website: https://tirj.org.in, Page No. 524 - 535*
*Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue*

*with modern psychological discourse sets his mythological adaptation apart as a distinctive literary achievement.*

## Discussion

ক্রমবিবর্তিত মানবসভ্যতার স্থির অন্তর্লীন প্রত্নপ্রতিমাকে (Archtype) ধারণ করে, মিথ-পুরাণের কাহিনিসমূহ যুগে যুগে আধার হয়েছে; জীবন রহস্য বর্ণনায়, জটিলতর মানবমনের দ্বন্দ্ব মীমাংসায় ও জীবন সম্পর্কে গভীর পরিজ্ঞান দানের। বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সংক্ষুব্ধ-সময়ের বিপন্ন-বাস্তবতার পটে, আধুনিক মানবের অন্তর্দ্বান্দ্বিক জীবনভাষ্য বয়ানে কাব্যনাট্যকে আধার ও পুরাণকে আধেয়রূপে গ্রহণ করে বাংলার সাহিত্য-পরিমণ্ডলে যাঁর দেদীপ্যমান পদচারণা প্রাতিস্বিকতায় ভাস্বর হয়ে রয়েছে তিনিই কলাকৈবল্যবাদী লেখক বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪)।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সাহিত্যের উপজীব্য হিসেবে মিথ-পুরাণের প্রয়োগ অপ্রতুল নয়। প্রতীচ্যে খ্রিষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীতে গ্রিক মহাকবি হোমারের লেখনীতে ট্রয়ের যুদ্ধ সংক্রান্ত মিথের সমাবেশে রচিত ইলিয়ড-ওডিসি থেকে খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে কালজয়ী ট্র্যাজেডি নির্মাতা নাট্যকারগণ এস্কাইলাস-সফোক্লিস-ইউরিপিদিসের সৃষ্টিতে মিথকে মূল অবলম্বন হিসেবে নাটকে গ্রহণ করতে দেখা যায়। আধুনিক সময়ে মিথাশ্রয়ী সাহিত্য রচনার সংখ্যাও কম নয়। এ ধারায় উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিকগণের মধ্যে জেমস জয়েস (১৮৮২–১৯৪১), টমাস স্টার্নস এলিয়ট (১৮৮৮–১৯৬৫), আলবেয়ার কাম্যু (১৯১৩–১৯৬০), জাঁ পল সার্ত্রে (১৯০৫–১৯৮০) প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

তাঁদের মধ্যে কেউ মিথ-পুরাণকে রচনা-কাঠামোর সঙ্গী করেছেন, কেউ আধুনিক মনস্তত্ত্বের কোন বৈশিষ্ট্যকে ব্যাখ্যা করতে মিথের কোন অনুষঙ্গকে ব্যবহার করেছেন, আবার কেউ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মিথের মিথস্ক্রিয়া ঘটিয়েছেন। প্রাচ্যের সাহিত্যাঙ্গনে কখনও বিষয় বৈভবে আবার কখনও প্রকরণশৈলীতে মিথ-পুরাণের স্বকীয় প্রয়োগ প্রত্যক্ষ করা যায় যাঁর কাব্যনাটকে তিনি সব্যসাচী লেখক বুদ্ধদেব বসু। বুদ্ধদেব রচিত পুরাণাশ্রয়ী কাব্যনাটকসমূহ হল— *তপস্বী ও তরঙ্গিনী* (১৯৬৬), *কালসন্ধ্যা* (১৯৬৯), *অনাম্নী অঙ্গনা* (১৯৭০), *প্রথম পার্থ* (১৯৭০), *সংক্রান্তি* (১৯৭৩)। এ ধারার গদ্যনাটকের মধ্যে রয়েছে *ইক্ষাকু সেন্নিন* (১৯৭১), *কলকাতার ইলেকট্রা* (১৯৬৭), *সত্যসন্ধ* (১৯৬৭)। শেষ বয়সে তিনি রচনা করেন *মহাভারত* বিষয়ক তাঁর ভিন্ন চিন্তার প্রতিফল প্রবন্ধগ্রন্থ *মহাভারতের কথা* (১৯৭৪)।

মার্কিনমুলুকের ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনাকালে (১৯৬৩) তুলনামূলক সাহিত্যবিচার সূত্রে ইন্দো-ইউরোপীয় এপিক *ইলিয়ড-ওডিসি-ঈনীড* এবং অপরপক্ষে ভারতীয় পৌরাণিক মহাকাব্য *রামায়ণ-মহাভারত* বিষয়ক তাঁর অনুসন্ধিৎসু লেখক মনে যে সকল প্রশ্নের ও কৌতূহলের উদ্রেক ঘটে তারই বহিঃপ্রকাশ পরবর্তীকালে তাঁর রচিত পুরাণাশ্রয়ী কাব্যনাটক। মূলত ভারতবর্ষীয় জাতির 'স্বরচিত স্বাভাবিক ইতিহাস'[১] *মহাভারত*-ই তাঁর আগ্রহের মূল কেন্দ্রস্থল।

বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাটকের মধ্যে সবার্পেক্ষা বিখ্যাত *তপস্বী ও তরঙ্গিনী* কাব্যনাটকটি পৌরাণিক ঋষ্যশৃঙ্গ উপাখ্যানকে আশ্রয় করে রচিত। ঋষ্যশৃঙ্গ উপাখ্যানের মূলে রয়েছে উর্বরতার প্রত্নপ্রতিমা। বাল্মিকী *রামায়ণের* আদিকাণ্ডে, বৌদ্ধ জাতকগ্রন্থে অলম্বুষা জাতক-৫ এবং নলিনিকা জাতক-৫২৬ এ ঈষৎ সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য সহযোগে ঋষ্যশৃঙ্গ উপাখ্যানের সন্ধান মেলে। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের *মহাভারতে* সবিস্তারে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির কাহিনি অন্তর্ভুক্ত আছে। *মহাভারতের* আরণ্যক পর্বের ১১০-১১৩ সর্গে, পদ্মাপুরাণের পাতাল-১৩, মহাবস্তুভদ্রকল্পাবদান-৩৩, অবদান কল্পলতা-৬৫, ১০১ প্রভৃতি স্থানে এর অস্তিত্ব মেলে।[২] ঋষ্যশৃঙ্গ পুরাণের কাহিনিসার হলো, অপাপবিদ্ধ আজন্ম ব্রহ্মচারী তাপস্বী ঋষ্যশৃঙ্গের কৌমার্যনাশের মধ্য দিয়ে অনাবৃষ্টিজনিত বন্ধ্যত্ব আক্রান্ত অঙ্গরাজ্যকে বর্ষণমুখর করে পুনরায় তার উর্বরতা ফিরিয়ে আনার আখ্যান। প্রাচীন বহুল প্রচলিত লোকবিশ্বাস অনুসারে নর-নারীর মিলনে দূর হয় বন্ধ্যত্ব, আসে বৃষ্টি, প্রকৃতি হয় উর্বরা, ধরিত্রী হয় শস্য শ্যামলা। উর্বরতার এ প্রত্নপ্রতিমাকে আশ্রয় করেই গড়ে উঠেছে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির কাহিনি।

অলম্বুষা জাতকে এ কাহিনি কিছুটা ভিন্ন। সেখানে হিমালয়বাসী কঠোর ধ্যানমগ্ন 'শীলতেজা' ঋষ্যশৃঙ্গের তপশক্তি দ্বারা শক্রভবন ভীত হলে সুচতুরা বারাঙ্গনা অলম্বুষাকে নিয়োগ করা হয় ঋষ্যশৃঙ্গের কৌমার্য নাশের উদ্দেশ্যে। পরবর্তীকালে ঋষ্যশৃঙ্গের তপোভঙ্গের মধ্য দিয়ে শক্রভবন শঙ্কামুক্ত হন। অন্যত্র, নলিনিকা জাতকে, কাশীরাজ্যের অনাবৃষ্টিজনিত দুরবস্থার

OPEN ACCESS
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 59*
*Website: https://tirj.org.in, Page No. 524 - 535*
*Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue*

প্রতিকার করতে শক্রর পরামর্শে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্ত স্বীয় কন্যা নলিনিকাকে তপস্বী ঋষ্যশৃঙ্গের ধ্যানভঙ্গের কাজে নিয়োজিত করেন। *রামায়ণে* আবার ঋষ্যশৃঙ্গের কাহিনি সংক্ষিপ্ত রূপে পাওয়া যায়, যেখানে হরিণীগর্ভে ঋষ্যশৃঙ্গের জন্ম লাভ কিংবা এ-সংক্রান্ত বৃত্তান্ত অনুপস্থিত। মূলত কালীপ্রসন্ন সিংহ অনূদিত *মহাভারতে* বর্ণিত ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির আখ্যানই বুদ্ধদেব বসু তাঁর *তপস্বী ও তরঙ্গিণী* কাব্যনাটকের ভিত্তিভূমি হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এ কথা তিনি তাঁর 'কবিতা ও আমার জীবন : আত্মজীবনীর ভগ্নাংশ' শীর্ষক প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন এভাবে -

> "... 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী'— ঐ নাটকটাকেও কাব্যজাতীয় রচনা বলে ধরে নিচ্ছি— সেটা আমি লিখেছিলাম আটান্ন বছর বয়সে, কিন্তু প্রথম যখন আমি ভেবেছিলাম তখন আমি সবে মাত্র উত্তরতিরিশ। সেই আমি প্রথম নিচ্ছি কালীপ্রসন্নর মহাভারতের আস্বাদ: সব বিস্তার ও অনুপুঙ্খসমেত ঋষ্যশৃঙ্গের উপাখ্যান পড়ে চমকে উঠেছি— এর আগে পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের 'পতিতা'র বাইরে কিছুই জানতাম না। দুর্ভিক্ষের পশ্চাৎপট, গাঁয়ের মেয়েরা, অজ্ঞান কিশোর তপস্বী ও বিদগ্ধ চতুর বারাঙ্গনার প্রথম দৃষ্টিবিনিময়ের আশ্চর্য মুহূর্ত —এই সবই আমার কল্পনায় ধৃত হয়েছিল তখন, রূপকল্পের আভাস জুগিয়েছিল এলিয়টের 'মার্ডার ইন দি ক্যাথিড্রেল' নাটকটা। মনে পড়ে লিখেও ফেলেছিলাম গাঁয়ের মেয়েদের মুখে প্রথম দুটো লাইন— সে—দুটো দিয়েই 'তপস্বী ও তরঙ্গিণী'র আরম্ভ...।[৩]

শৈশবের মুগ্ধতার সঙ্গে মিথ-পুরাণ-সংক্রান্ত বিস্তর জ্ঞানার্জন বুদ্ধদেবকে তাঁর কাব্যনাটক রচনায় অনুপ্রেরণা জোগায় আর এভাবেই বুদ্ধদেব বসুর সাহিত্যজীবনে কাব্যনাটক রচনার প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছে। *মহাভারত* থেকে তাঁর গৃহীত আখ্যানটির সাররূপ তিনি তাঁর *তপস্বী ও তরঙ্গিণী* কাব্যনাটক রচনার প্রায় সমকালে রচিত কাব্য *মরচে পড়া পেরেকের গান* (১৯৬৬) এ উল্লেখ করেছেন।

ত্রিশোত্তর কালের আধুনিক বাংলার কবি বুদ্ধদেব বসুর চেতনালোকে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব অনস্বীকার্য। রবীন্দ্রনাথের *কথা ও কাহিনীর* (১৯০০) অন্তর্ভুক্ত 'পতিতা' কবিতাটি বুদ্ধদেবকে ব্যাপকভাবে আলোড়িত করে। 'পতিতা' কবিতার বিষয়বস্তু এবং তার কিছু বয়ন কৌশলও বুদ্ধদেব তাঁর *তপস্বী ও তরঙ্গিণী* নাটকে গ্রহণ করেছেন। 'পতিতা' কবিতাটি ঋষ্যশৃঙ্গের তপোভঙ্গের দায়িত্বে নিয়োগপ্রাপ্ত অনাম্নী বারাঙ্গনার হার্দিক প্রেমচেতনার এক সকরুণ প্রকাশ। ধন-সম্পদ নয়, নয় কোনো আভূষণ, এ কবিতায় হার্দ্য প্রেমে অভিভূত বারাঙ্গনা উত্তীর্ণ হয়েছে সকল পার্থিব কামনা থেকে। নিজেকে তিনি তরুণ তাপসের বিশুদ্ধ দৃষ্টিপাতে আবিষ্কার করেছেন নবভাবে। বারাঙ্গনার কণ্ঠে যে রোমান্টিক হার্দ্য প্রেমের আন্দোলন ধ্বনিত হতে শোনা যায়, তা-ই পরবর্তীকালে বুদ্ধদেবের তরঙ্গিনী চরিত্র গঠনের ভিত্তি রচনায় অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। পুরাণে যার নাম-পরিচয় অবধি স্থান পায়নি, কেবল তার অস্তিত্বকে আশ্রয় করে বুদ্ধদেব নির্মাণ করলেন দ্বন্দ্ববিজড়িত মানবিক পূর্ণাঙ্গ এক নারী চরিত্র। অপরপক্ষে বুদ্ধদেব নির্মিত ঋষ্যশৃঙ্গ চরিত্রের বীজসূত্র মিলবে, *মরচে পড়া পেরেকের গান* কাব্যের দ্বাবিংশতম কবিতা 'মরচে পড়া পেরেকের গান' —এ, যা এ কাব্যের নাম কবিতা। এ কবিতায় ঋষ্যশৃঙ্গের দৃষ্টিকোণ থেকে তার জীবনের অপ্রাপ্তি আক্ষেপ ও নৈঃসঙ্গ বিবৃত হয়েছে। আধুনিক মানুষের দ্বন্দ্বজর্জর অস্তিত্বের কথা জানান দিয়ে ধ্বনিত হয়েছে অতৃপ্ত হৃদয়ের আর্তি -

> বিবর্ণ দিন, প্রেমহীন তিক্তকাম রাত্রি,
> তিক্ত আমার মন্ত্রপূত মিলন, উৎপীড়ন আমার বীজস্রোত
> যার তেজে বৃষ্টি নামে, ফসল ফলে। যে-দেশে আমি হর্ষধারা
> নামিয়েছি,
> একা আমি শুকনো।
>
> ('মরচে পড়া পেরেকের গান', মরচে পড়া পেরেকের গান)

পুরাণের এ আখ্যানকে বুদ্ধদেব বসু স্বীয় জ্ঞান-প্রজ্ঞা কল্পনাশক্তি ও কবিত্বশক্তি দিয়ে এক নবজন্ম দিয়েছেন। উর্বরতা প্রত্নপ্রতিমার মিথ যে দুষ্প্রাপ্য নয় তা বুদ্ধদেব বারংবার তাঁর রচনায় ব্যাখ্যা করেছেন। বুদ্ধদেব বসু রচিত আরেক নাটক *ইক্কাকু সেনিন* কোম্পারু মোতায়াসু (১৪৫৩–১৫৩২) রচিত জাপানি নো নাটকের অনুবাদ,[৪] যেখানে ইক্কাকু ঋষ্যশৃঙ্গের

OPEN ACCESS
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 59*
*Website: https://tirj.org.in, Page No. 524 - 535*
*Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue*

জাপানি প্রতিরূপ। এছাড়া পাশ্চাত্যের 'হোলি গ্রেইল' মিথটির আদি উৎস প্রাচ্যের ঋষ্যশৃঙ্গ উপাখ্যান। এ মিথ থেকেই টি এস এলিয়টের *পোড়োজমি* কাব্যের পট নির্মিত।

এ অংশে কালীপ্রসন্ন সিংহের অনূদিত *মহাভারত* থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে, যা দ্বারা মূল পৌরাণিক আখ্যান সম্পর্কে অবগত হওয়া যাবে এবং একই সঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর নাটকের সাথে আখ্যানের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের দিকগুলো চিহ্নিত করা যাবে। কালীপ্রসন্ন সিংহ অনূদিত *মহাভারতে*র বনপর্বের ১১০, ১১১, ১১২ ও ১১৩ সর্গে ঋষ্যশৃঙ্গ উপাখ্যান বর্ণিত রয়েছে। বুদ্ধদেব ঋষ্যশৃঙ্গের জন্মবৃত্তান্ত এখান থেকে গ্রহণ করছেন। কেবল তাঁর নাটকে ঋষ্যশৃঙ্গের শিরোদেশে অবস্থিত শৃঙ্গ প্রসঙ্গটি পরিহার করেছেন। *মহাভারতে* উল্লেখ আছে এরূপে -

> "মহাতপাঃ ঋষ্যশৃঙ্গ জন্মাবধি তপঃপরায়ণ হইয়া কেবল কাননমধ্যেই বাস করিতেন; পিতা ভিন্ন আর কোনো মনুষ্যই তাঁহার নয়নগোচর হয় নাই; এই জন্য তাঁহার অন্তঃকরণ নিরন্তর ব্রহ্মচর্যানুষ্ঠানেই ব্যাপৃত ছিল। সেই সময়ে দশরথের সখা লোমপাদ অঙ্গদেশের অধিরাজ হইয়াছিলেন। তিনি স্বেচ্ছানুসারে ব্রাহ্মণের সহিত ব্যবহার ও পুরোহিতের প্রতি অত্যাচার করাতে, ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল; এই নিমিত্তে সহস্রলোচন তাঁহার রাজ্যে বারিবর্ষণ নিষেধ করিয়া প্রজাগণকে পীড়ন করিতে লাগিলেন। একজন মুনি রাজাকে কহিলেন ...ঋষ্যশৃঙ্গ নামে সরলস্বভাব—সম্পন্ন নারী—পরিচয়বর্জিত আজন্ম—বনবাসী ঋষিকুমারকে আনায়ন করিবার উদ্যোগ করুন। সেই মহাতপাঃ আপনার দেশে প্রবেশ করিবামাত্রই বারিবর্ষণ হইবে, সন্দেহ নাই।"[৫]

অঙ্গরাজ্যের দুর্দশা, অনাবৃষ্টির কারণ, মুনি নির্দেশিত প্রতিকারের পথ, বৃদ্ধ বারাঙ্গনার এ কাজে সম্মতি প্রদান, বৃদ্ধ বারাঙ্গনা কন্যার আশ্রমে প্রবেশ, ঋষ্যশৃঙ্গের সঙ্গে কথোপকথন— এসকলই পুরাণের অনুকূলে *তপস্বী ও তরঙ্গিণী* নাটকে মেলে। এছাড়া তিনি এখান থেকে আরো গ্রহণ করেছেন আগন্তুকের শরীরী বর্ণনা -

> "ঋষ্যশৃঙ্গ কহিলেন, পিতঃ! অদ্য এই আশ্রমে নাতিখর্ব্ব ও নাতিদীর্ঘ এক জটিল ব্রহ্মচারী আগমন করিয়াছিলেন; তাঁহাকে অবলোকন করিলে দেবতা বলিয়া প্রতীতী হয়। তাঁহার বর্ণ সুবর্ণসদৃশ, লোচন কমলের ন্যায় আয়ত স্নিগ্ধ, রূপ সাতিশয় মনোহর, প্রভা সূর্য্যের ন্যায়, তাঁহার মস্তকে রজ্জু—গ্রথিত সুদীর্ঘ নীল নির্ম্মল জটাভার ...।"[৬]

বিভাণ্ডকের অনুধাবনে বিলম্ব হয় না যে আগন্তুক কোনো তপস্বী বা দেবতা নন, বরং নারী। কিন্তু তা পুত্রকে না জানিয়ে বরং তাঁদের তিনি ছলনাময়ী রাক্ষস হিসেবে অভিহিত করেন। বিভাণ্ডক ক্ষণিকের জন্য আশ্রম ত্যাগ করলে বারবিলাসিনীগণ মোহিত ঋষ্যশৃঙ্গকে অঙ্গরাজ্যে নিয়ে যান। অঙ্গরাজ্যে বর্ষণ শুরু হয়। লোমপাদের কন্যা শান্তার সঙ্গে ঋষ্যশৃঙ্গ পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। শান্তা পতিব্রতা স্ত্রীর মতো ঋষ্যশৃঙ্গের সেবা করেন। এক বৎসরকাল অতীত হলে শান্তা পুত্রবতী হন এবং ঋষ্যশৃঙ্গ পিতৃআজ্ঞায় আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করেন। পুরাণের কাহিনি এখানে শেষ হলেও বুদ্ধদেব বসুর কাহিনিতে স্বকীয়তার সূত্রপাত ঘটেছে মূলত এখান থেকে। পুরাণে ঋষ্যশৃঙ্গ-বিভাণ্ডক-লোমপাদ-শান্তা কেবল এই চারটি চরিত্র পাওয়া যায়। কিন্তু নাট্যকার এ নাটকে তরঙ্গিণীকে সৃষ্টি করেছেন নিজ কল্পনায়। পুরাণে বৃদ্ধ বারাঙ্গনা ও তাঁর নিপুণা কন্যার ইঙ্গিত থাকলেও তারা সেখানে মুখ্য হয়ে ওঠেননি। অথচ বুদ্ধদেব বসুর রচনায় তারাই হয়ে উঠেছেন কাহিনির মূল আকর্ষণ শক্তি। অন্যদিকে, অংশুমান, চন্দ্রকেতু, রাজমন্ত্রী এসকল অপৌরাণিক চরিত্রগুলো তিনি নির্মাণ করেছেন কাহিনিকে ঘন সন্নিবেশিত করার জন্য। এই একটি সরল আখ্যানকে সাহিত্যরসে জারিত করে বুদ্ধদেব বসু দৃশ্যায়নযোগ্য কাব্যময় দেহাবয়বে নাটকে রূপ দিয়েছেন। কেবল তাই নয়, তার অঙ্গে-অঙ্গে যুক্ত করেছেন মানসিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত। চরিত্রগুলোকে করে তুলেছেন জীবন্ত। কাম-প্রেমের চিরন্তন দ্বন্দ্ব বিষয়ে প্রদান করেছেন নিজস্ব দর্শন। এভাবেই তিনি তাঁর এ কাব্যনাটকে পুরাণের পুনর্জন্ম ঘটিয়েছেন।

চার অঙ্কবিশিষ্ট, কোনোরূপ দৃশ্য বিভাজন বর্জিত তুলনামূলক দীর্ঘ কলেবরের কাব্যময় গদ্য ভাষায় রচিত কাব্যনাটক *তপস্বী ও তরঙ্গিণী*। নাটকটি *দেশ* পত্রিকায় ১৯৬৬ সালের এপ্রিল সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়। ১১টি চরিত্রের মধ্যে ঋষ্যশৃঙ্গ ও তাঁর পিতা বিভাণ্ডক, বারাঙ্গনা তরঙ্গিণী ও তাঁর মাতা লোলাপাঙ্গী, অঙ্গরাজের কন্যা শান্তা, রাজমন্ত্রী ও তাঁর

OPEN ACCESS
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 59*
*Website: https://tirj.org.in, Page No. 524 - 535*
*Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue*

পুত্র চন্দ্রকেতু, রাজপুরোহিত, দুইজন রাজদূত, এবং এক দল গ্রামের মেয়ের কোরাস ও কিছু অপ্রধান চরিত্র সহযোগে নাটকটি নির্মিত হয়েছে। চার অঙ্কের কালিক ব্যবধান কাহিনির কার্যকারণে তাৎপর্যবাহী— প্রথম ও দ্বিতীয় অঙ্কের মধ্যবর্তী সময় ব্যবধান একদিনের, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঙ্কের কালিক দূরত্ব এক বছরকাল এবং শেষ দুই অঙ্কের সংঘটন কাল একই দিন।

প্রথম অঙ্কের চমকপ্রদ সূচনা বুদ্ধদেব বসুর বিশ্বসাহিত্য সম্পর্কে অগাধ জ্ঞানকে মনে করিয়ে দেয়। এক দল গাঁয়ের মেয়ের কোরাসের মধ্য দিয়ে মঞ্চের পর্দা উন্মোচিত হয়েছে। রাজপ্রাসাদের সিংহদ্বার ও উদ্যানের কিয়দংশ দৃশ্যমান, তৎসংলগ্ন রাজপথে গ্রামের মেয়েরা কাব্যময় ভাষায় সমস্বরে পেশ করছেন তাঁদের বর্তমান দুর্দশা, জানতে এসেছেন তাঁদের রাজ্যের প্রতিপালকের নিকট এর প্রতিকার। তাঁদেরই কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে অঙ্গরাজ্যের বর্তমান অভিশপ্ত অবস্থা। নাটকে দীর্ঘ অনাবৃষ্টিতে খরা, প্রখর রৌদ্রের দাহ, আসন্ন দুর্ভিক্ষ, শূন্য নারীর ক্রোড়, শুষ্ক গাভীর বাট, নিষ্ঠুর আকাশ এনং নির্দয় মেঘ সমগ্র অঙ্গরাজ্যের বন্ধ্যত্বকেই প্রকাশ করেছে -

> "গাঁয়ের মেয়েরা।
> আকাশের সূর্যের অটল আক্রোশ, জ্বলছে রুদ্রের রক্তচক্ষু,
> মাটির ফাটে বুক, শুকনো জলাশয়, ধুঁকছে নির্বাক পশুরা;
> শস্যহীন মাঠ, বন্ধ্যা সধবারা, দিনের পরে দিন দীর্ণ, শূন্য—
> বৃষ্টি নেই!
> দুঃখ আমাদের মুখরা ননদিনী, মৃত্যু আমাদের পূজ্য ব্রাহ্মণ,
> তবু তো কিছু ভালো মেনেছি সংসারে, জেনেছি দেবতারা বন্ধু—
> যেহেতু ফ'লে ওঠে সোনালি ধান আর সোনার সন্তান মায়ের কোলে,
> এবং অগ্নি ও জলের মিতালিতে অমৃতস্বাদ পায় অন্ন।"[৭]

গাঁয়ের মেয়েদের এরূপ সংলাপ ব্যবহারে বুদ্ধদেব বসু টি.এস. এলিয়টের *মার্ডার ইন দ্য ক্যাথেড্রাল* (*Murder in The Cathedral*, 1935) কাব্যনাটকে ব্যবহৃত সূচনা অংশের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন।[৮] একই পরম্পরা অনুসরণ করে নাটকের সংকটের দিকে প্রথমেই পাঠক-দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করানো হয়েছে। গ্রিক বিখ্যাত ট্র্যাজেডিতে একইভাবে কোনো এক বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে কাহিনি উন্মোচিত হত। উদাহরণস্বরূপ, সফোক্লিসের *রাজা ঈদিপাস* নাটকের কথা স্মরণ করা যায়। *রাজা ঈদিপাস* নাটকে দুর্দশাগ্রস্ত জনপদের বিবরণ সকরুণ ভঙ্গিমায় উঠে এসেছে জনগণের কণ্ঠে। এই একই পরম্পরায় বুদ্ধদেব বসুর *তপস্বী ও তরঙ্গিণী* নাটকের গাঁয়ের মেয়েদের ভূমিকাও মূল্যায়ন করা যায়। কেবল বিপর্যস্ত জীবনযাত্রার কথাই *তপস্বী ও তরঙ্গিণী* নাটকের কোরাস অংশে বর্ণিত হয়েছে তা নয়, প্রথা ও সংস্কারের ধারক ভারতীয় প্রান্তিক গৃহবধূদের নিত্যদিনের সহজ-সরল জীবনাচারের শাশ্বত চিত্রও এখানে প্রত্যক্ষ করা যায়। যৌথ পরিবার চিত্র, সমাজে ব্রাহ্মণের পূজনীয় অবস্থান, মধুমতী গাভী প্রসঙ্গ, ঢেঁকির গম্ভীর পতনধ্বনি, ব্যাঙের ছাতা-শিশিরবিন্দু-এসকলই গ্রাম্যজীবন ও প্রথাগত ভারতীয় নারীর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এ অংশের 'অগ্নি ও জলের মিতালিতে অমৃতস্বাদ পায় অন্ন' —এ পঙক্তির তাৎপর্য ব্যাখ্যায় ড. পুষ্পেন্দুশেখর গিরির মন্তব্যটি বিশেষ গুরুত্ববহ -

> " 'অগ্নি ও জলের মিতালি'কে আপাত দৃষ্টিতে মনে হয়েছে অ্যাপারটমেন্ট কনট্রাডিকশন। তবুও নাট্যঘটনায় এর একটা অদৃশ্য প্রভাব রয়েছে... অগ্নি আর জল যেন তপোধন ঋষি ঋষ্যশৃঙ্গ আর জল হল গণিকাগণের মধ্যমনি লোলাপাঙ্গী কন্যা তরঙ্গিনী। দু'জনের নব আবিষ্কার।"[৯]

অর্থাৎ পরস্পর দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত শক্তির মিলনে সকল প্রকার বন্ধ্যত্ব ঘুচেছে। অন্ন যেরকম বর্ষণ ছাড়া উৎপন্ন হয় না, অগ্নি ছাড়া আহার্য হয়ে ওঠে না, অথচ তারা বৈপরীত্যের প্রতীক, সেরকম নাটকে ঋষি ঋষ্যশৃঙ্গ ও বারাঙ্গনা তরঙ্গিণী বিপরীত শক্তির ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেও বৈপরীত্যের মিলনে যে নতুন প্রাণের জন্ম হয়, নাটকে সেটাই হয়ে উঠেছে সারসত্য।

OPEN ACCESS
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 59*
*Website: https://tirj.org.in, Page No. 524 - 535*
*Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue*

গাঁয়ের মেয়েদের আর্ত বিলাপের মধ্যে মঞ্চে প্রবেশ ঘটেছে রাজদূত সুশ্রুত ও মাধবসেনের। প্রথম দূতের দীর্ঘ সংলাপের মাধ্যমে নাট্যকার অঙ্গরাজ্য ও প্রতিবেশী রাজ্যগুলো সম্বন্ধে, তাদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে সবিস্তারে আলোকপাত করেছেন, পুরাণের আখ্যান ভাগে যার উল্লেখ মাত্রও ছিল না। স্থানিক নাম ও অবস্থানসমূহ মহাভারতের অন্যান্য অংশের সঙ্গে সংগতি রেখে গ্রহণ করে তিনি কাহিনির বিশ্বস্ততাকে আরো ঘনীভূত করে তুলেছেন। অনাবৃষ্টিজনিত দুর্ভিক্ষের কারণ যে রাজার পাপের ফল, প্রথম দূতের সংলাপে তা প্রকাশ পেয়েছে। নাটকে পাপ-পুণ্য, কর্ম-কর্মফল, দৈব-ভবিতব্য-সংক্রান্ত দূতদ্বয়ের পারস্পরিক অভিমত আধুনিক দ্বন্দ্বজড়িত মানসিকতার ইঙ্গিতবাহী -

> "২য় দূত। দৈবজ্ঞ? (হেসে উঠে) শোনোনি সেই যবন দেশের কাহিনি? রাজা অগ্নিমাণিক্য দৈবজ্ঞের নির্দেশে আপন ঔরসজাত
> তরুণী কন্যা ফেনভঙ্গিনীকে পশুর মতো বলি দিয়েছিলেন।
> ১ম দূত। শুনেছি যবন দেশে দেবতারাও ধূর্ত ও হিংসাপরায়ণ। কিন্তু আর্যাবর্তে দেবতারা অসুরকেও বরদান করেন।
> ২য় দূত। কিন্তু এমন যদি হয় যে দেবতারা মানুষেরই কপোলকল্পনা?
> ১ম দূত। ধিক্ পাপবাক্য!
> ২য় দূত। এমন যদি হয় যে ধর্ম নেই, শাস্ত্রসমূহ প্রহেলিকামাত্র, আর অন্ধকারে আমাদের আলো শুধু আলেয়া?
> ১ম দূত। তবু কর্ম আছে। দেবতা ও বেদ যদি মিথ্যা হয়, কর্ম তবু সনাতন। আর কর্মফলেরই নামান্তর হ'লা দৈব।"[১০]

এখানে ধ্বনিত হয়েছে প্রাচীন সনাতনী বিশ্বাস। লক্ষণীয় যে, বুদ্ধদেব সুকৌশলে প্রাচ্য পুরাণের সমান্তরালে এ অংশে গ্রিক মিথের অনুষঙ্গ এনেছেন। হোমারের ইলিয়ড থেকে তিনি আগামেমনন-ক্লাইটেমনেস্ট্রা-ইফিজিনিয়া-অরেস্ট্রস আখ্যানের ইঙ্গিতে যবন রাজা অগ্নিমাণিক্য-অক্লমশ্রী-ফেনভঙ্গিনী-অরিষ্ট নামাঙ্কিত করে অভিনবত্বের পরিচয় দেন। কেবল পাশ্চাত্য মিথ নয়, ভারতীয় পুরাণের অন্য অনেক আখ্যানের ইঙ্গিতও পাওয়া যায় সংলাপের মাধ্যমে। যেমন ইতিহাসে বারাঙ্গনার সুকৃতি, ভরতবংশের আদিমাতা প্রসঙ্গ, সুন্দ-উপসুন্দ আখ্যান প্রভৃতি।

আর্যাবর্তের সনাতনী বিশ্বাসে প্রকৃতি ও জীবন বারংবার একিভূতরূপে কল্পিত হয়েছে। নারীর উর্বরাশক্তি মৃত্তিকার উর্বরাশক্তির সঙ্গে, বৃষ্টির ও জলের স্পন্দন প্রাণের স্পন্দনের তুলনা হতে দেখা গেছে। পঞ্চভূতের বিশেষত জলের বন্দনা অতিপ্রাচীন কাল থেকে প্রচলিত। রাজপুরোহিতের সংলাপে নাট্যকার সে চেতনারই প্রকাশ ঘটালেন।

নাটকের এ পর্যায়ে প্রবেশ ঘটে দৃঢ়চেতা, স্পষ্টবাদী ও অধিকার-সচেতন রাজনন্দিনী শান্তার, পুরাণে যার একাধিক পরিচয় বিদ্যমান। কখনো তিনি দশরথপুত্রী এবং লোমপাদের পালিত পুত্রী আবার কখনো দশরথ ও লোমপাদ একই ব্যক্তিরূপে কল্পিত এবং সেখানে শান্তা তাঁর ঔরসজাত কন্যা। শান্তা দৃঢ়তার সঙ্গে রাজমন্ত্রীর সম্মুখে তাঁরই পুত্র অংশুমানের সঙ্গে নিজ প্রণয়ের বিষয়টি ব্যক্ত করেছেন। শান্তা রাজমন্ত্রীকে ক্ষাত্রনারীর স্বয়ম্বরা হবার অধিকারের প্রথাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। এ দৃঢ়চেতা নারীকেই পরবর্তীকালে পরিস্থিতির বশবর্তী হয়ে তপস্বী ঋষ্যশৃঙ্গের সঙ্গে পতিব্রতা নারীর মতো সংসার করতে দেখা গেছে। বৃহত্তর স্বার্থে এ কি আত্মবলিদান নাকি প্রথাগত নারীর মতো দৈবকে মেনে নেবার পরিচয় বহন করে তা নির্দ্বন্দ্ব নয়।

তরঙ্গিণী যখন মঞ্চে প্রবেশ করেন, সূচনা সংলাপেই তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতির পরিচয় মেলে। রূপবতী ও বিবিধ শাস্ত্রে পারদর্শী তরঙ্গিণীর 'ধর্ম বহুর পরিচর্যা'। এক পুরুষে আসক্তিকে তিনি তাঁর জন্য পাপচিন্তা বলে আখ্যা দান করেছেন। স্বভাবস্বৈরিণী তরঙ্গিণীরই পরবর্তীকালে হার্দ্য প্রেমে উত্তরণ ঘটাবেন নাট্যকার। মা ও গুরু লোলাপাঙ্গীর দর্শিত পথ ও পরামর্শে উজ্জীবিত তরঙ্গিণী ষোলোজন সুন্দরী সখী, ফুল-মধু-সুগন্ধী, মণিমাণিক্য, ঘৃতপক্ক মাংস-পায়সান্ন, দ্রাক্ষা-রতিফল, বিবিধ বাদ্যযন্ত্র সহযোগে সুসজ্জিত ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রমের উদ্দেশ্যে নৌযাত্রায় বেরিয়ে পড়ার পরিকল্পনায় বিভোর।

OPEN ACCESS
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 59*
*Website: https://tirj.org.in, Page No. 524 - 535*
*Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue*

প্রথম ও দ্বিতীয় অঙ্কের নির্মাণে নাট্যকার পৌরাণিক আখ্যানের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করেছেন। যদিও সংক্ষিপ্ত আখ্যানকে অবলম্বন করে তিনি তাঁর কল্পনা ও কবিত্ব শক্তির দ্বারা সুবিস্তৃত নাট্যঘটনার নির্মাণ করেছেন। কল্পনা ও কবিত্বের যথাযোগ্য যোজনার ফলেও নাট্যদেহের বহিরঙ্গে কোথায়ও পৌরাণিক আবহের বিচ্যুতি ঘটেনি। পুরাণ ব্যবহারে সাহিত্য সৃজনের এই এক অভিনব পথপ্রদর্শণ করেছেন নাট্যকার।

দ্বিতীয় অঙ্কের পর্দা উন্মোচিত হয়েছে ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রমে। ঊষাকালে, ঋষ্যশৃঙ্গ সূর্যপ্রণামরত। আজন্ম তপস্বী যুবক ঋষ্যশৃঙ্গের দিনাতিপাত সুশৃঙ্খল, সংযত। তাঁর সংলাপেই নিত্যদিনের যাপিত জীবনের পরিচয় মেলে। প্রকৃতি যাঁর সখা, পিতা ভিন্ন অন্য কোনো মানব দ্বারা যার আচরণীয় নিয়ন্ত্রিত-প্রভাবিত নয়, সেই ঋষ্যশৃঙ্গের সঙ্গে এ অংশে প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে নারীর, যাঁর অস্তিত্ব সম্পর্কে তপস্বী ঋষ্যশৃঙ্গ একেবারেই অবগত ছিলেন না। নাট্যকার পুরাণে বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্বের অনুষঙ্গে রচিত নেপথ্য সংগীতের মধ্য দিয়ে মঞ্চে তরঙ্গিণীর প্রবেশ ঘটান। এটি আসন্ন ঘটনার ইঙ্গিতবাহী -

> "জাগো, সৃষ্টির আদি শিহরণ,
> জাগো, বিষ্ণুর নাভিপদ্ম!
> কারো, ব্রহ্মার মতি চঞ্চল,
> আনো, দুর্বার মায়াদ্বন্দ্ব।
> এসো, শম্ভুর গিরিশৃঙ্গে
> বধূ, গৌরীর দেহসৌরভ!
> বাজো, শূন্যের বুকে ওঙ্কার,
> জাগো, বিশ্বের বীজমন্ত্র!"[১১]

সৃষ্টিতত্ত্ব, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবের উৎপত্তি-সংক্রান্ত পুরাণ, শিব-শক্তির পুরাণ, ওঙ্কার ধ্বনির পৌরাণিক মাহাত্ম্য সকলই সুচারুরূপে পরিমিতিবোধ সহযোগে এখানে উপস্থাপিত হয়েছে।

মানব মনের সহজাত কৌতূহল যেরূপ অজানা অপরিচিতের প্রতি আগ্রহ জন্ম দেয়, ঋষ্যশৃঙ্গও তাঁর সহজাত সৌন্দর্যবোধে প্রথম দর্শনেই তরঙ্গিণীকে কোনো শাপভ্রষ্ট দেব বা তাপস মনে করেন। আর তাঁর কণ্ঠ ধ্বনিত হয় সেই সংলাপ যার আবেশে তরঙ্গিণীর চিত্তে আলোড়ন সৃষ্টি হয় -

> "ঋষ্যশৃঙ্গ। ...সুন্দর আপনার আনন, আপনার দেহ যেন নির্ধূম হোমানল, আপনার বাহু, গ্রীবা ও কটি যেন ঋকছন্দে আন্দোলিত। আনন্দ আপনার নয়নে, আনন্দ আপনার চরণে, আপনার ওষ্ঠধরে বিশ্বকরুণার বিকিরণ।"[১২]

বেদজ্ঞ, শাস্ত্রপাঠে অভিজ্ঞ, শুদ্ধ চিত্ত তাপসের পক্ষে এরূপ বিশুদ্ধ রোমান্টিক উচ্চারণ অস্বাভাবিক নয়। চরণগুলো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পতিতা' কবিতার পঙ্ক্তির সাথে তুলনীয় -

> "কহিলা কুমার চাহি মোর মুখে,
> ফুটে আনন্দ বাহুতে তোমার,
> ...
> 'আনন্দময়ী মুরতি তুমি,
> ছুটে আনন্দ চরণ চুমি।"
>
> (পতিতা, কথা ও কাহিনি)

অথচ নিজ দায়িত্ব সচেতন কুশলী তরঙ্গিণীর চিত্তেও প্রশ্ন জেগেছে। আজন্ম স্বৈরিণী তরঙ্গিণীর প্রতি বহুপুরুষ মোহিত হয়েছে, আকৃষ্ট হয়েছে, কিন্তু কেউই এভাবে তাঁর প্রতি বিশুদ্ধ রোমান্টিক দৃষ্টিপাত করেননি, উচ্চারণ করেননি এরকম রোমান্টিক বাণী। তবু কার্য সম্পাদনে তরঙ্গিণী কৌশলী বলেই তিনি কৌশলে ঋষ্যশৃঙ্গকে কামপাশে আবদ্ধ করেছেন এভাবে-

> "তরঙ্গিণী। তবে আরম্ভ হোক অনুষ্ঠান। জাগ্রত হোক সুপ্তেরা। সুপ্ত হোক যারা জাগ্রত। গলিত হোক শিলা। মুক্ত হোক প্রবাহ। ...ক্ষেত্রে বীজ, ক্ষেত্রে হল; গর্ভে বীজ, গর্ভে জল।"[১৩]

OPEN ACCESS
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 59*
*Website: https://tirj.org.in, Page No. 524 - 535*
*Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue*

উপর্যুক্ত সংলাপের ছত্রে-ছত্রে উর্বরতা-মিলন ও নবসৃষ্টির বাণী ধ্বনিত। ঋষ্যশৃঙ্গের যে ব্রহ্মচর্য এতকাল জাগ্রত ছিল সুপ্ত হয়েছে তা আর যে কামনা সুপ্ত ছিল তা হয়েছে জাগ্রত। মাল্য-আলিঙ্গন-চুম্বনে তরঙ্গিণী সম্পাদন করলেন তার 'পরিচর্যা ধর্ম', ঋষ্যশৃঙ্গকে কামপাশে আবদ্ধ করলেন। মঞ্চে অতঃপর বিভাণ্ডকের প্রবেশ, যাঁর কাছে ঋষ্যশৃঙ্গ সবিস্ময়ে বর্ণনা করেছেন আগন্তুকের রূপ। *মহাভারত* ও নলিনিকা জাতকের মতো *তপস্বী ও তরঙ্গিণী* নাটকের এ বর্ণনাও বহুবর্ণিল কাব্যময় -
নলিনিকা জাতকে বারাঙ্গনার রূপের বর্ণনা এরকম -

> "জটাধারী ব্রহ্মচারী এসেছিল এক,
> নাতিদীর্ঘ, নাতি খর্ব্ব, সুগঠিতকায়,
> সুদর্শন, সুবিনীত-মস্তকে তাহার
> বিরাজে ভ্রমরকৃষ্ণ-কেশের কলাপ।"[১৪]

*তপস্বী ও তরঙ্গিণী* নাটকে এ বর্ণনা এরকম -

> "ঋষ্যশৃঙ্গ। তিনি এক আশ্চর্য ব্রহ্মচারী। দীর্ঘকায় নন, খর্বকায় নন, দেবতার মতো কান্তিমান। কনকতুল্য তাঁর বর্ণ, দেহ সুঠাম ও সংকেতময়; তাঁর মস্তকে নীল নির্মল সংহত জটাভার। শঙ্খের মতো গ্রীবা; দুই কর্ণ যেন উজ্জ্বল কমণ্ডলু। নয়ন তাঁর আয়ত ও স্নিগ্ধ; আনন যেন উদ্ভাসিত ঊষা; বার্লাকের মতো আকর্ষণ তাঁর কপোল।"[১৫]

কূটনৈতিক পরিকল্পনা অনুসারে এরূপে সম্মোহিত ঋষ্যশৃঙ্গকে অঙ্গরাজ্যে নিয়ে আসা তরঙ্গিণীর জন্য দুঃসাধ্য কিছুই নয়। বুদ্ধদেব পুরাণের এ ভাষ্যে যুক্ত করেছেন কবির ভাষ্য, যেখানে ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিণীর চেতনালোকের পরিবর্তন ঘটে যায়। তাদের সংলাপে সে ইঙ্গিত স্পষ্ট -

> "ঋষ্যশৃঙ্গ। আমি জেনেছি তুমি কে। তুমি নারী।
> তরঙ্গিণী। কুমার, আমি তোমার সেবিকা।
> ঋষ্যশৃঙ্গ। আমি জেনেছি আমি কে। আমি পুরুষ।
> তরঙ্গিণী। তুমি আমার প্রিয়। তুমি আমার বন্ধু। তুমি আমার মৃগয়া। তুমি আমার ঈশ্বর।
> ঋষ্যশৃঙ্গ। তুমি আমার ক্ষুধা। তুমি আমার ভক্ষ্য। তুমি আমার বাসনা।"[১৬]

তপস্বীর আজন্ম সুপ্ত ইন্দ্রিয়লালসা যখন স্বভাববৈরিণী তরঙ্গিণীর সংস্পর্শে জাগ্রত, জাগ্রত আদিম প্রবৃত্তির তাড়না, তখনই সুকুমার শুদ্ধ তপস্বীর সংস্পর্শে এবং তার জ্যোতিদীপ্ত নেত্রপাতে বারাঙ্গনার চিত্তে উদিত হয়েছে রোমান্টিক প্রেমভাব। নাট্যকারের ভাষায়-

> "দ্বিতীয় অঙ্কের শেষে নায়ক-নায়িকার বিপরীত দিকে পরিবর্তন ঘটলো; একই মুহূর্তে জেগে উঠলো তরঙ্গিণীর হৃদয় এবং ঋষ্যশৃঙ্গের ইন্দ্রিয়লালসা; একই ঘটনার ফলে ব্রহ্মচারীর হ'লো 'পতন' আর বারাঙ্গনাকে আকস্মাৎ অভিভূত করলো 'রোমান্টিক প্রেম'—যে—ভাবে রবীন্দ্রনাথের 'পতিতা'য় বর্ণিত আছে, সেই ভাবেই।"[১৭]

নাটকে এমন শৈল্পিক সংযোজনা পুরাণ প্রয়োগে বুদ্ধদেব বসুর কবি ও শিল্পী সত্তার প্রকাশক। তবে লক্ষণীয় বিষয় হল পুরাণকে ভিন্নপথে চালনা করে নয়, বরং পুরাণ পথের অন্ত রেখায় নিজ সৃষ্ট রথের সারথী হয়ে উঠলেন তিনি।

ঋষ্যশৃঙ্গের আগমনে বর্ষণমুখর অঙ্গরাজ্যের ইঙ্গিতে দ্বিতীয় অঙ্কের যবনিকাপাত। তৃতীয় অঙ্কের সূচনা এক বৎসর পরে, তরঙ্গিণীর কক্ষে, তাঁকে প্রত্যক্ষ করা যায় বিরহী বেশে। তৃতীয় অঙ্ক থেকে পুরাণ প্রশমিত হয়ে গেছে। কবি কল্পনায় চরিত্র-কাহিনি-নাট্যদ্বন্দ্ব-নাট্যক্রিয়ার উদ্ভব ঘটেছে। তবে লক্ষণীয় যে, পৌরাণিক আবহের কোথাও কোনো ছেদ ঘটেনি। এ অঙ্কের প্রথমভাগে দুটি অপৌরাণিক চরিত্র চন্দ্রকেতু ও অংশুমানের বিরহ, অপ্রাপ্তি উপস্থাপন করেছেন নাট্যকার। দুজনেরই বিরহের কারণ ঋষ্যশৃঙ্গ। অংশুমানের একটি সংলাপ এখানে উল্লেখযোগ্য, "কতকাল তাকে দেখি না। চোখে আমার অনাবৃষ্টি। দুর্ভিক্ষ হৃদয়ে।"[১৮] অঙ্গরাজ্যের অনাবৃষ্টি-দুর্ভিক্ষ ও তার প্রতিকার পুরাণের আখ্যান, আর নাটকের পাত্র-পাত্রীর হৃদয়ের অনাবৃষ্টি-দুর্ভিক্ষ এবং তার ফলাফল প্রতিবিধান নাট্যকারের অভিপ্রায়। এ অংশে লোলাপাঙ্গী চরিত্রের আরেক প্রস্থ বিকাশ

OPEN ACCESS
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 59*
*Website: https://tirj.org.in, Page No. 524 - 535*
*Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue*

লক্ষ করা যায়। তরঙ্গিণীর প্রণয়াকাঙ্ক্ষী দর্শনাকাঙ্ক্ষী চন্দ্রকেতুকে তিনি প্রবোধ দেন, আশা তাঁর জাগিয়ে রাখার কুশলী চেষ্টায় রত হন। এ অংশে তরঙ্গিণী ও লোলাপাঙ্গীর কথোপকথন তরঙ্গিণীর রূপান্তরিত সত্তাকে উপস্থাপন করে। লোলাপাঙ্গী তাঁকে সম্বোধন করেছেন 'তরঙ্গিণী', 'তরণী', 'তরু' বলে। এ নামগুলোর মধ্যে তরঙ্গিণী চরিত্রের রূপান্তর ইঙ্গিতবহ হয়ে উঠেছে। 'তরঙ্গিণী' নামে সে, উচ্ছল উদ্বেল স্বভাবস্বৈরিণী স্বভাবের প্রতীক। 'তরণী' নামে সে পারকর্তা তরী, যে তপস্বী ঋষ্যশৃঙ্গের আত্ম— আবিষ্কারের সোপানস্বরূপ, অঙ্গরাজ্যের দুর্ভিক্ষের প্রতিকারের উপায়স্বরূপ। 'তরু' নামে সে বৃক্ষের মতো দৃঢ়, অবিচল, একনিষ্ঠ প্রেয়সী, ঠিক যেন রাধার মতো। একদিকে তরঙ্গিণী সকল প্রকার জাগতিক বিষয়ে বিমুখ, প্রাচ্যের বিরহিণী রাধারাণীর মতো নিরবচ্ছিন্ন বিরহকাতর-ভাবোন্মত্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছেন। অপরদিকে লোলাপাঙ্গী তাঁর ভবিষ্যৎ চিন্তায় মাতৃস্নেহে ও পেশাগত কারণে বারংবার তাঁকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টারত। এ কাজে তাঁর কিছু সংলাপযোজনে বুদ্ধদেব বসুর বিশেষ কুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়। 'ব্রাহ্মণের যেমন বেদপাঠ ধর্ম, তেমনি আমাদের ধর্ম পরিচর্যা', 'আমরা যে যার কর্ম নিয়ে সংসারে আসি, কর্ম শেষ হ'লে চ'লে যাই। একের কর্ম অন্যের সাজে না— এই হ'ল চতুর্মুখের অনুশাসন'[১৯] অর্থাৎ চতুর্মুখ ব্রহ্মার বিধান। সনাতন শাস্ত্রের কঠোর বিধানের দিকটিতে নাট্যকার ইঙ্গিত করছেন, যা গীতার ৩য় অধ্যায়ের ৩৫তম শ্লোকে পাওয়া যায় এভাবে -

> "শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
> স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ।।"[২০]

শ্লোক অনুসারে নিজ-নিজ কর্ম সম্পাদন করাই ধর্মের বিধান, সে কাজ যেমনই হোক না কেন, নিষ্ঠাভরে তার সম্পাদনই ধর্ম। যেমনটি লোলাপাঙ্গীর সংলাপে ধ্বনিত হয়েছে।

চন্দ্রকেতুকে তরঙ্গিণী ঋষ্যশৃঙ্গের মাপকাঠিতে পরখ করে দেখতে চান। তাঁদের কথোপকথনে স্পষ্ট হয় চন্দ্রকেতু তরঙ্গিণীর রূপমুগ্ধ, তাঁর দৈহিক সংস্পর্শের প্রত্যাশী। তরঙ্গিণী অনুসন্ধান করেন তাঁর সেই ভিন্ন রূপ যা ঋষ্যশৃঙ্গ তাঁর প্রথম দর্শনে আবিষ্কার করেছিলেন -

> "তরঙ্গিণী। চন্দ্রকেতু, সত্যি বলো—আমি রূপবতী? দ্যাখে —নিবিড় চোখে তাকিয়ে দ্যাখো আমার দিকে। আমার মনে হয় আমার মুখের তলায় অন্য এক মুখ লুকিয়ে আছে। তুমি দেখতে পাচ্ছো? আমার মনে হয় আমার অন্য এক মুখ ছিল—আমি তা হারিয়ে ফেলেছি। আমি খুঁজি সেই মুখ। তুমি তা ফিরিয়ে দিতে পারো?"[২১]

পৃথিবীর প্রথম নারীর প্রতি প্রথম পুরুষের হৃদয়তাপ থেকে তরঙ্গিণীর সেই হার্দ্য প্রেমের সূচনা। এখানে বুদ্ধদেব বসু উল্লিখিত W. B. Yeats (1865-1939) এর কবিতার প্রভাব লক্ষণীয় -

> 'I'm looking for the face I had
> Before the world was made'.
> (A Woman Young and Old: 11)

সৃষ্টির সূচনালগ্নে নর-নারীর দৃষ্টিতে বিরাজমান মুগ্ধতার অনুসন্ধানে রয়েছেন কবি। এ বাণীরূপ তরঙ্গিণীর চেতনায় ক্রিয়াশীল।

চতুর্থ অঙ্কের সূচনায় রাজপ্রাসাদের একটি কক্ষে ঋষ্যশৃঙ্গের প্রথম সংলাপে তাঁর অন্তর্লোকের সংক্ষুব্ধ দ্বন্দ্বপীড়িত অবস্থার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। জীবনের প্রথম নারী তরঙ্গিণীকে দেখে যে জৈবিক চেতনার উদ্ভব ঘটে তাঁর চিত্তে, তা আর নির্বাপিত হয়নি। রাজগৃহ, রাজকন্যা শান্তা তাই তাঁর কাছে বিস্বাদ। কাম-আকাঙ্ক্ষার কণ্টকপাশে ঋষ্যশৃঙ্গের শান্ত সমাহিত তপস্বী হৃদয় বিলুপ্ত। আনমনা চিত্তে জড়বস্তুর মতো ঋষ্যশৃঙ্গ কেবল তার কর্ম সম্পাদন করে গেছেন, আর সম্মোহিত হয়ে থেকেছেন সেই প্রথমার ভাবনায়। বলা বাহুল্য, এসবের কিছুই পৌরাণিক নয়, কবিকল্পনা। এ অংশে শান্তা-ঋষ্যশৃঙ্গের কথোপকথনে তাঁদের মধ্যকার সূক্ষ্ম মানসিক দূরত্ব, রাজ-কর্তব্যের খাতিরে কর্ম, প্রীতিহীন বন্ধনের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। পুরাণকে পশ্চাতে রেখে এরকম মানসিক দ্বন্দ্ব সংঘাতের সূক্ষ্ম চিত্র অঙ্কনে বুদ্ধদেব সিদ্ধহস্ত।

OPEN ACCESS
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 59*
*Website: https://tirj.org.in, Page No. 524 - 535*
*Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue*

একবছর কাল অঙ্গরাজ্যে অবস্থান করে তপস্বী অপাপবিদ্ধ ঋষ্যশৃঙ্গের মধ্যে যে রূপান্তর ঘটেছে, তাঁর মধ্যে যে কূটনৈতিক রাজনৈতিক জ্ঞানের জন্ম হয়েছে, তার কিছু নমুনা পাওয়া যায় অংশুমান ও ঋষ্যশৃঙ্গের বাক্যবিনিময়ে। লোলাপাঙ্গী-অংশুমানের দ্বারা ঋষ্যশৃঙ্গ তরঙ্গিণী সম্পর্কে অবগত হলে মঞ্চে পুনরায় পূর্ব বেশভূষায় তরঙ্গিণীর প্রবেশ ঘটে। তরঙ্গিণী ঋষ্যশৃঙ্গের নয়নে পূর্বের সেই বিশুদ্ধ রোমান্টিক মুগ্ধতা দেখতে চান, সেই বাণী শুনতে চান, কিন্তু তা আর সম্ভব নয়। সেই তপস্বীর পরিবর্তন ঘটে গেছে। প্রকৃতপক্ষে ঋষ্যশৃঙ্গের সংলাপের মতো সত্য এই যে, 'কেউ কি কোথাও ফিরে যেতে পারে, তরঙ্গিণী? আমরা যখনই যেখানে যাই, সেই দেশই নূতন। আমার সেই আশ্রম আজ লুপ্ত হ'য়ে গিয়েছে। সেই আমি লুপ্ত হ'য়ে গিয়েছি।'[২২]

যুবরাজ ঋষ্যশৃঙ্গ সর্বসম্মুখে স্বীকার করেন তরঙ্গিণী নাম্নী এ বারাঙ্গনারই জন্যে তাঁর প্রতীক্ষা। সেই তাঁর জাগরণের কারণ, কামনা ও অতৃপ্তির কারণ। বর্তমানে তাঁর 'হৃদয়ের বাসনা', 'শোণিতের হোমানল', 'তৃষ্ণার্তের জল'। তরঙ্গিণীর ব্যথিত হৃদয় বলে ওঠে-

> "ঋষ্যশৃঙ্গ, তোমার চোখের আলোয় আবার আমি নিজেকে দেখতে চাই। চাই রোমাঞ্চিত হ'তে, আনন্দিত হ'তে। আমাকে তুমি করুণা করো।"[২৩]

অতঃপর ঋষ্যশৃঙ্গের চেতনার জাগরণ ঘটলো। তিনি সমস্ত উপলব্ধি করলেন, তাঁর মোহ প্রশমিত হল এবং তিনি কর্তব্য স্থির করলেন। এ রূপান্তর উপস্থাপনে বুদ্ধদেব পরিমিতিবোধের পরিচয় দিয়েছেন। নির্দেশনা অংশে লক্ষ করা যাবে –

> "তরঙ্গিণীর শেষ কথাগুলি শুনতে-শুনতে ঋষ্যশৃঙ্গের মুখে ফুটলো প্রথমে সংশয়, তারপর বেদনা, অবশেষে শান্তি।"[২৪]

এখানে সংশয় ঋষ্যশৃঙ্গের দ্বন্দ্বকে নির্দেশ করেছে অতঃপর বেদনা তাঁর উপলব্ধির পরিচায়ক এবং শান্তি এসেছে, মোহ প্রশমিত চিত্তে কর্তব্য স্থিরকরণে। ঋষ্যশৃঙ্গ শান্তাকে কৌমার্য প্রত্যর্পণ করে অংশুমানের সঙ্গে সুখী হওয়ার বরদান করলেন। কৌমার্য প্রত্যর্পণের বিষয়টি পৌরাণিক আখ্যানসমূহে বহুল প্রচলিত একটি ধারণা। দেব, ঋষি, তপস্বীর দ্বারা এ ঘটনা প্রায়ই ঘটে এসেছে পুরাণে। যেমন কুন্তীকে সূর্যদেব, সত্যবতীকে পরাশর কৌমার্য প্রত্যর্পণ করেছিলেন। এ নাটকের শেষে লোলাপাঙ্গীকে চন্দ্রকেতুর আশ্রয়ে রেখে ঋষ্যশৃঙ্গে রাজগৃহ থেকে সমস্ত দায়-দায়িত্ব থেকে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার উদ্যোগ নেন। তিনি অনুধাবন করেছিলেন, তরঙ্গিণীর সেই পূর্বরূপ তাঁর চোখে আর ফিরবে না কারণ তাঁর সেই পূর্বদৃষ্টি লুপ্ত হয়ে গেছে। তাই তরঙ্গিণীকে তিনি অভিনন্দন জানিয়ে নিজ পিতা বিভাণ্ডকের আমন্ত্রণ প্রত্যাখান করে অজানার পথে পা বাড়ালেন। যেখানে তাঁর আর পূর্বের বিধিবদ্ধ ধর্মাচারের প্রয়োজন পড়বে না। শিষ্য কিংবা গুরু কেউই সঙ্গী হবে না। ঋষ্যশৃঙ্গ আত্ম-আবিষ্কারের পথে অগ্রসর হলেন। নাট্যকারের ভাষায়-

> "ঋষ্যশৃঙ্গ। সহস্র নয় একজন। আমি ঘুমন্ত ছিলাম, সে আমাকে জাগিয়েছিল। আবার আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, আবার আমাকে জাগিয়ে দিয়ে গেলো সে। সে-ই আমার বন্ধন, সে-ই আমার মুক্তি। আমার সর্বস্ব।"[২৫]

ঋষ্যশৃঙ্গের কথার এই প্রথম জাগরণ মূলত তাঁর প্রবৃত্তির জাগরণ এবং দ্বিতীয়বার ঘুমিয়ে পড়া মূলত তাঁর মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়ার প্রতীক। তরঙ্গিণীই তাঁকে কামপাশে আবদ্ধ করে, আবার তরঙ্গিণীই তাঁর মধ্যে উপলব্ধির জাগরণ ঘটিয়ে তাঁকে মুক্তি দেন। এভাবেই বুদ্ধদেব বসু পুরাণের এক সাধারণ ঘটনার ভেতর অসাধারণত্বের বীজ রোপিত করে তাকে বিকশিত করলেন প্রাতিস্বিকতায়।

বুদ্ধদেব বসুর সাহিত্যের ভাষিক উৎসস্রোত রবীন্দ্রনাথ থেকে আগত। পরবর্তীকালে এই ভাষা প্রাচ্য-পাশ্চাত্য জ্ঞানে, অর্থাৎ সংস্কৃত ও ইংরেজি ভাষা দক্ষতায় জারিত হয়ে এক নবতর উৎকর্ষিত রূপ লাভ করে। তাঁর ব্যবহৃত কাব্যনাটকের পাত্র-পাত্রীর ভাষা কৃত্রিম হলেও তা কৃত্রিমতার অনুভূতি জাগায় না। বাস্তবিক নিত্যদিনের ব্যবহারিক ভাষা থেকে দূরবর্তী হয়েও বিষয়ের গভীরতা ও প্রয়োগ কৌশলের নৈপুণ্যে তা যথোপযুক্ত। প্রসঙ্গত কমলেশ চট্টোপাধ্যায়কৃত *তপস্বী ও তরঙ্গিণী* কাব্যনাটকের ভাষা সংক্রান্ত বিশ্লেষণটি স্মরণ করা যায় -

OPEN ACCESS
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 59*
*Website: https://tirj.org.in, Page No. 524 - 535*
*Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue*

> "নায়ক-নায়িকার প্রেমালাপ এবং অন্যান্য চরিত্রের আলাপের ভাষাও বুদ্ধদেব প্রাচীন ঐতিহ্যের ভূমি থেকেই গ্রহণ করেছেন। নাটকের প্রধান সব চরিত্র যথা, ঋষ্যশৃঙ্গ, তরঙ্গিনী, শান্তা প্রায় সকলেই, এমন অলৌকিক ভাষায় কথা বলেন—যে ধরণের বাক্য ব্যবহার এ যুগের কোনো ঋষি, রাজকুমারী বা বারাঙ্গনা করতে পারে না, অথচ সেই অপ্রাকৃত সংলাপকে আমরা মেনে নিই, কারণ বুদ্ধদেব ভারতীয় প্রাচীন ঐতিহ্যের পরিবেশকে তাঁর নাট্যকাহিনীর রূপাবয়বের মধ্যে গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছেন।"[২৬]

তাঁর নাটকের অন্যতম উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে তাঁর ভাষা প্রয়োগের প্রাতিস্বিকতায়। নাট্যকার বুদ্ধদেব বসু তাঁর কাব্যনাটকে পৌরাণিক পরিমণ্ডল সৃষ্টির উপযোগী তৎসম শব্দবহুল ভাষার সাবলীল প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। ভাষার ওজস্বী রূপের সঙ্গে অলংকার যোজনায় সংলাপ হয়ে উঠেছে গুরুগম্ভীর এবং পৌরাণিক আবহের অনুকূল।

পুরাণ প্রয়োগে নিষ্ঠাবান থেকেও নাট্যকার বহুবিধ শাখা-প্রশাখার সৃষ্টি করেছেন তাঁর নাটকে। এই নাটকে পৌরাণিক চরিত্রের মানবিক উত্থান-পতন সৃজনে, অপৌরাণিক চরিত্র নির্মাণে, নাট্যিক অভিপ্রায় বাস্তবায়নে বুদ্ধদেব বসু অসামান্য দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন। নাটকের স্তরে-স্তরে প্রকাশ পেয়েছে আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা ও টানাপোড়েন, গূঢ় দার্শনিকতা, শাশ্বত উপলব্ধির বাণীরূপ। প্রসঙ্গত, পুষ্পেন্দুশেখর গিরির অভিমত স্মরণযোগ্য -

> "বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাট্যগুলিতে ভারতীয় পুরাণের অনুষঙ্গে, কাহিনীর অন্তরালে প্রসারিত শাশ্বত মানবাভিজ্ঞতার সঙ্গে ব্যক্তিক অনুভব ও স্ব-কালের জীবনজটিলতাকে যুক্ত ক'রে অমেয় রহস্য ও অনন্ত ইঙ্গিতে গূঢ় করে তুলেছেন।"[২৭]

কাম ও প্রেম চেতনাকে কেন্দ্র করে তপস্বী ঋষ্যশৃঙ্গ ও স্বভাবস্বৈরিণী তরঙ্গিণীর মানবিক উত্থান-পতন, দ্বন্দ্ব-মীমাংসার আখ্যান হয়ে উঠেছে বহুল প্রচলিত এ উর্বরতার পুরাণকাহিনি। পুরাণের ছায়াতলে নির্মিত হয়েছে নবতর কাহিনি, নবতর দর্শন, নবতর ভাবনা।

## Reference:

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' শীর্ষক প্রবন্ধ, রবীন্দ্র-রচনাবলি, সৈয়দ আকরম হোসেন (সম্পাদিত), ষোড়শ খণ্ড, ঐতিহ্য, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ৫৪৫-৫৬৭
২. গিরি, পুষ্পেন্দুশেখর, বুদ্ধদেব বসু-র তপস্বী ও তরঙ্গিণী নবমূল্যায়ন, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৩ পৃ. ১৩
৩. বসু, বুদ্ধদেব, 'কবিতা ও আমার জীবন: আত্মজীবনীর ভগ্নাংশ শীর্ষক প্রবন্ধ, প্রবন্ধ সমগ্র চতুর্থ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০১৫, পৃ. ৬৩৫
৪. সেনগুপ্ত, সমীর, বুদ্ধদেব বসুর জীবন, বিকল্প প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯১৮, পৃ. ৩৫৪
৫. বেদব্যাস, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, মহাভারত, কালীপ্রসন্ন সিংহ (অনূদিত), বসুমতী কার্যালয়, কলকাতা, ১৯০০, পৃ. ২২৫
৬. প্রাগুক্ত
৭. বসু, বুদ্ধদেব, বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাটক সমগ্র ১, দময়ন্তী বসু সিং (সম্পাদিত), দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৩, পৃ. ১৭
৮. Eliot, T.S., Murder in The Cathedral, Faber and Faber, London, 1955, p.1
৯. গিরি, পুষ্পেন্দুশেখর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯
১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০
১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬
১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০
১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২
১৪. গিরি, পুষ্পেন্দুশেখর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১
১৫. বসু, বুদ্ধদেব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬
১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১

OPEN ACCESS
*Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
*A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture*
*Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 59*
*Website: https://tirj.org.in, Page No. 524 - 535*
*Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue*

১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬
১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪
১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০
২০. ঘোষ, শ্রীজগদীশ চন্দ্র, শ্রীগীতা, ষষ্ঠদশ সংস্করণ, প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরি, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ৭৬
২১. বসু, বুদ্ধদেব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২
২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০
২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১
২৪. প্রাগুক্ত
২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯
২৬. চট্টোপাধ্যায়, কমলেশ, বাংলা সাহিত্যে মিথের ব্যবহার: বুদ্ধদেব বসুর তপস্বী ও তরঙ্গিনীর ভূমিকা, মর্ডাণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৮০, পৃ. ১৪৯
২৭. গিরি, পুষ্পেন্দুশেখর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬